Vol. 27 | No. 2 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে বাঙ্গালী নারী

Volume	27
Issue	2
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রাজিয়া সুলতানা
Published online	April 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v27i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v27i2.4
Pages	91-122
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

৲ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে বাঙ্গালী নারী

রাজিয়া সুলতানা

'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' কাব্যের সম্পাদনাকালে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছিলেন —"প্রাচীন পুঁথির তিনটি অঙ্গ আমাদের সবিশেষ আলোচ্য ; প্রথমে উহার সাহিত্যাংশ ; দ্বিতীয়ে উহার ভাষা, তৃতীয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে উহার স্থান এবং প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে উহার সহায়তা"।[১] প্রচলিত ইতিহাসে রাজা ও রাজ্যের উত্থান-পতনের ঘটনাপঞ্জী প্রধান—সাধারণ মানুষ সেখানে উপেক্ষিত। সাধারণ মানুষের ইতিহাসউদ্ধারে তাই প্রাচীন সাহিত্যের সহায়তা অপরিহার্য। প্রাচীন কাব্য অনুসরণে বাঙ্গালী নারীর জীবনধারার পরিচয় ও প্রকৃতি উদ্ঘাটনই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্বভাব ও প্রবণতা

বাংলাদেশের আবহাওয়ার প্রভাব বাঙ্গালী নারী-চরিত্রে অত্যধিক। বাঙ্গালী মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ, কর্মদক্ষতা, আহার-বিহার, রুচি-অরুচি, সামাজিক আচার, সংস্কার ও বিশ্বাস —সবকিছুই বাংলাদেশের জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অসময়ে বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের আবির্ভাব হয় ব'লে তাঁরা স্বভাবে সাবধানী এবং সঞ্চয়ী। আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন নয় ব'লেই তাঁরা প্রকৃতিতেও উগ্র নন। আবার, তাঁদের চরিত্র এ'দেশের ষড়ঋতুর ফল-সম্ভারের মতই যে তিক্ত, মধুর, লবণ, অম্ল, কটু ইত্যাদি বহুস্বাদের এবং বিচিত্রধর্মী —তা' বোঝা যায় কাব্যে বর্ণিত জীবনাচরণ, আনন্দ-বেদনা এবং উৎসব বা অনুষ্ঠানাদির মধ্যে। ডাকের (আ. দশম শতাব্দী) বচনে লক্ষ্য করা যায়, যে-নারী রন্ধনকর্মে পটিয়সী, সঞ্চয়ী, লজ্জাশীলা ও অতিথিপরায়ণা—তিনিই আদর্শ বাঙ্গালী নারী :

মিঠ রান্ধে সরুআ কাটে।
সে গৃহিণীতে ঘর না টুটে।।
রৌদ্রে কাঁটকুটায় রান্ধে।
খড় কাঠ বর্ষাক বান্ধে।।
কাঁখ কলসী পানিক যায়।
হেঁট মুণ্ড কাকুহো না চায়।।
যেন যায় তেন আইসে।
বলে ডাক গৃহিণী সেই সে।।[২]

ডাকের এ-সদুক্তি থেকে প্রতীতি হয়—সে-যুগের বাঙ্গালী-জননী কন্যাকে প্রথম শিক্ষা দিয়েছিলেন শ্রমশীলতা, লজ্জাশীলতা আর মিতব্যয়িতা। মেয়েদের সংসার-প্রিয় এক শুচিস্নিগ্ধ জীবনযাত্রার নিম্নরূপ পরিচয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে :

ভোরেতে উঠিয়া কন্যা ভোরের সিনান করে।
শুদ্ধ শান্তে যায় কন্যা রন্ধন শালার ঘরে॥
উবু হইয়া বান্ধ্যা কেশ আইট্যা বসন পরে।
গাংগের না পানি দিয়া ঘর মাঞ্জন করে॥[৩]

কোন কোন নগর-বাসিনী ও বিলাসিনীর চালচলন পল্লী অঞ্চলে নিন্দনীয় ছিল। বাঙ্গালী কবি গোবর্ধন আচার্য (দ্বাদশ শতাব্দী) এক শ্লোকে বলেন :

ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিল-নগরাচারাম্
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি।

("সখি সোজা পা ফেলে চল, নাগরাচার সব ছাড়। কটাক্ষপাত করলেও এখানে গাঁয়ের মাতব্বর ডাইনী বলে দণ্ড দেয়")।[৪]

অপর এক কবি লক্ষ্মীধরের (আ. ষোড়শ শতাব্দী) কবিতায় কুলমহিলার যে-বর্ণনা আছে তা' এ'যুগেও বাংলাদেশের উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের আদর্শ :

শিরো যদবগুণ্ঠিতং সহজ রূঢ়লজ্জানতং
গতং চ পরিমন্থরং চরণ কোটিলগ্নে দৃশৌ।
বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং
নিজং তদীয়মঙ্গলা বদতি নূনমুচ্চৈঃ কুলম্॥

("ঘোমটা-ঘেরা মাথা স্বতঃই লজ্জাবনত, চলন ধীর, চোখ পায়ের দিকে নিবদ্ধ, বাক্য স্বল্প এবং মৃদুমধুর—এই দিয়ে যেন এই মহিলা উচ্চস্বরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করছেন")।[৫]

সে-যুগের মেয়েমহলে সমবয়স্কদের প্রতি ভালবাসা ছিল অত্যধিক। তরুণীদের সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা বর্ণিত হয়েছে এক কাব্যে। এখানে দেখা যায় পরস্পরের সহানুভূতির ঘরোয়া চিত্র :

এক সখী তুলা দিয়া হেরএ নিঃশ্বাস।
কমলের দানা কেহ করএ লেপন॥
বাসু তৈল শিরেত লাগাএ কোনজন।
সখীগণ উপদেশ অনেক চিন্তএ॥[৬]

প্রসাধন, অলঙ্কার ও পোষাক-পরিচ্ছদ

সে-যুগের কাব্যদৃষ্টে এমন প্রতীতি হয় যে—মেয়েদের প্রসাধন ও অঙ্গসজ্জার ব্যয়ভার ছিল সামান্য। অধিকাংশ অঙ্গরাগ ও অঙ্গমার্জনার সামগ্রী ছিল দেশজ-উদ্ভিদজাত। কবি দোনাগাজী (সপ্তদশ শতাব্দী) তাঁর নায়িকার অঙ্গসজ্জা বর্ণনার প্রসঙ্গে বলেন:

মেন্দি দিয়া হাতে পায় সুগন্ধী মাখিয়া গায়
পবিত্র বসনে মুছি অঙ্গ।[৭]

'তিল-তৈল' 'আমলকী' 'গিলা' হরিদ্রা' 'পিঠালী'[৮]—ইত্যাদি সে যুগের তরুণীরা কেশে, ত্বকে এবং মুখমণ্ডলে প্রলিপ্ত করে অঙ্গচর্চা করতেন। দরিদ্র-কান্তার অঙ্গরাগ বহুমূল্য ছিল না; সামান্য শঙ্খচূর্ণ, সিঁদুর ও হরিদ্রা তাঁদের প্রিয়বস্তু ছিল।[৯] পোষাক-পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র, কাঁথা—ইত্যাদি ধৌত করার জন্য সাবানের পরিবর্তে 'ক্ষার', 'কলার বাকলের ছাই', 'চুণ', 'গোমূত্র'[১০] 'মন পবন' নামক গাছের ছাই[১১]—ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: (ক) ধোপানী কাপড় কাচে ক্ষার আর খোলে/বেহুলা কাপড় কাচে শুধু গঙ্গা জলে।[১২] (খ) শত শত বস্ত্র ধোয় বিনা ক্ষার চূর্ণ।[১৩] কেশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য 'আমলকী'র (ফল বিশেষ) প্রয়োগ ছিল সর্বাধিক: 'সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী'।[১৪] সে যুগে চিরুণীর উল্লেখও কোন কোন কাব্যে রয়েছে—('চিরুনীতে কেশ আঁচড়াইয়া সখীগণ')।[১৫]

কালিদাসের যুগের 'নিপুণিকা-মালবিকাদের' মত 'ধারাযন্ত্রে'[১৬] হয়ত তাঁরা স্নান করতেন না, কিন্তু ধূপের ধোঁয়ায় কবরী সুবাসিত করতেন:

ধূপের ধোঁয়া দিয়া বাসিত করে কেশ॥[১৭]

প্রাচীন বাঙ্গালী কবি যোগেশ্বর (আ. ৮৫৯-৯০০ খ্রীঃ) প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে কৃষকযুবতীর প্রসাধনের তৃপ্তির বর্ণনা করেছেন এভাবে:

ব্রীহিঃ স্তম্ব করিঃ প্রভূত পয়সঃ প্রত্যায়তা ধেনবঃ
প্রত্যুজ্জীবিত মিক্ষুণা ভূশমিতি ধ্যায়ন্নপেতান্যধীঃ।
সান্দ্রো শীর কুটুম্বিনী স্তনভর ব্যালুপ্ত ঘর্মক্লমো।
দেবে নীরমুদার মুজ্ঝাতি সুখং শেতে নিশাং গ্রামণী॥[১৮]

অর্থাৎ—"প্রচুর পানির জন্য ধান বেশ গজিয়ে উঠেছে, গরুগুলি ঘরে ফিরে এসেছে, আখও প্রচুর হবে, অন্য চিন্তা আর নেই। ঘরের স্ত্রী এ'অবসরে স্নিগ্ধ উশীর বা বেনামূলের রসে প্রসাধন করতে সমর্থ হয়েছে। আকাশ থেকে অনবরত পানি ঝরছে, এ'অবস্থায় গ্রামের যুবকটি আরামে নিদ্রাগত"।[১৯] চীনা পর্যটক 'ফেই-শিনে'র 'শিং-ছা-শ্যং-লান' গ্রন্থ (১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত)-এর বরাত দিয়ে ডক্টর সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন—সে-যুগের বাংলাদেশের মেয়েদের রং ছিল 'সাধারণতঃ ফরসা', এইজন্য তাঁরা

অঙ্গরাগ ব্যবহার করত না। "চুলগুলি তারা মাথার পেছন দিকে খোঁপা করে বেঁধে রাখত"। কস্তুরী, আগর-চন্দন, চুয়া, আতর-গোলাপ জাতীয় সুগন্ধী, ইত্যাদির ব্যবহার অন্ত্য-মধ্যযুগের নারীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল :

আগর চন্দন চোওয়া মুকুতার কস্তুরী।
সুবেশ করিয়া (অঙ্গে) পরে চারি নারী।।
আতর গোলাপে অঙ্গ করিল ভূষিত।[২০]

বিবাহ-অনুষ্ঠানে কন্যার অঙ্গে বাটা-হলুদ লাগানো হ'ত। হলুদের পরের অনুষ্ঠান ছিল ক্ষীরখণ্ড খাওয়া :

আপনি মন্থরা অতি আনন্দিত মনা।
রাজপুরে হুলাহুলি উল্লাগ বাজনা।।
সখীগণ হরিষে হরিদ্রা দিল গায়।
সমাদরে কন্যাবরে ক্ষীরখণ্ড খায়।।[২১]

মেয়েদের চোখে কাজলের ব্যবহার প্রায় সমস্ত কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। সিঁদূরের ব্যবহার মুসলিম-নারী সমাজেও সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল :

কাজল সিন্দুর পরি করি নানা ছন্দ।
প্রতি লোমে মাখিয়া কুসুম মকরন্দ।।[২২]

মেয়েদের জীবনযাত্রার আদর্শ অনাড়ম্বর ছিল। তাঁদের অনুষ্ঠান-উদ্‌যাপনের ব্যয়ভারও ছিল যৎসামান্য। দ্বিজ মাধব-রচিত 'চণ্ডীকাব্যে' কন্যার বিবাহ-খরচের যে নমুনা পাওয়া যায়,[২৩] তাতে বিলাসদ্রব্য নেই ব'ললেই চলে :

২ টুকরা মাঝারী ধরনের কাপড়	২০ কড়ি
পান	৩ ,,
মরিচ	৩ ,,
খয়ের	১০ ,,
লবণ	২ ,,
চূন	১ ,,
মেটে সিঁদুর	৫ ,,
খুঁঞা (মোটা কাপড়)	৬ ,,
(৮০০০ হাজার কড়িতে ১ টাকা) মোট—	৫০ কড়ি

শাঁখা বা শঙ্খ, সিঁদূর ও কাজল এয়োতির চিহ্নস্বরূপ হিন্দু নারীর বেশ-ভূষায় অপরিহার্য ছিল :[২৪]

ক. সীমন্ত কপালে শোভে সুরঙ্গ সিন্দুর
খ. কুরঙ্গ কজ্জল আঁখি রঞ্জিত কজ্জলে

(মাধবাচার্য বিরচিত চণ্ডীকাব্য, ব. সা. প. প.১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪)

নারীর আটটি বিভিন্ন অঙ্গের শোভা বর্ধন করত বিচিত্র নামের সমস্ত অলঙ্কার। প্রথমে নাসিকার আভরণের বর্ণনা :

নাসিকার বেসর শোভা　　যুবকের মন লোভা
যেন তিন ফুলের আকৃতি।
নাসা মনোহর অতি　　গলে পরে গজমোতি
দেখিতে সুন্দর মন হরে।[২৫]

বাহুতে তারা পরত 'বাজুবন্ধ', হাতে 'কঙ্কণ' ও 'অঙ্গুরীয়' :

এন্দুর নাসিকা মূল　　বাহু মৃণাল তুল
বাহে তার পরে বাজুবন্ধ।
বাজু পরিল যথ　　তাহা আর কব কত
তাহাতে দিব্য পুষ্প মকরন্দ।।
নাগরী পঁইছি সাজে　　শঙ্খ কঙ্কণ বাজে
আঙ্গুলে পরিল অঙ্গুরী।[২৬]

পদ-যুগলের শোভাবর্ধনের জন্য তারা পরত বিচিত্র নামের অলঙ্কার :

চুর্ণটি উছ্ঠি যত　　বাঁক পাতা মল কত
পাএ পরে সুবর্ণ পাশলী।[২৭]

পুরুষরা সমস্ত অঙ্গে অলঙ্কার ব্যবহার করতেন না বটে, কিন্তু 'আংটি', 'নূপুর,' 'কুণ্ডল' ইত্যাদির ব্যবহারে তরুণরা সে-যুগের তরুণীদের মনোরঞ্জন করতেন।[২৮] সে-যুগের বিত্তশালী নারীদের অধিকাংশ অলঙ্কার ছিল মণিমুক্তা-খচিত। হাতের নীচের অংশে থাকত শাঁখা, ওপরের হাতে (বাজুতে) 'বাহুখড়', গলায় 'সাতনরী' হার, মাথায় 'হংসপদিকা', কানে সোনার 'তাড়ঙ্গ' ইত্যাদি গহনার বর্ণনা প্রাচীন কবিদের বর্ণনায় বেশ পাওয়া যায়।[২৯] আলাওলের 'পদ্মাবতী' বা অন্যান্য কাব্যে, যে-সমস্ত অলঙ্কারের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই রত্নখচিত :

রত্ন বাজুবন্ধ সোহে　　দেখি কুলবতী মোহে
নব রত্নাঙ্গুরী করশাখে।[৩০]

কটি-দেশের আভরণও রত্নখচিত হ'ত :

জড়াউ কোমরে পাটা　　সুবর্ণ রত্নের ছটা
দেখিতে নিঃস্বরে আঁখিজল।[৩১]

হস্তাভরণ নানা ধরনের ছিল। শাঁখা, কঙ্কণ, বলয় ও চুড়ি-গাজালোর মধ্যে বৈচিত্র্য ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায় :

দুই হাতে তাড় ছিল দেখিতে শোভন।
শঙ্খের সমুখে দিল সুবর্ণের কঙ্কন।।
পায় খাড়ু দিল আঙ্গুলে পাশলি।।
পায় খাড় দিল আঙ্গুলে পুচলি।।[৩২]

মেয়েদের পোশাকের যে-সমস্ত বর্ণনা দেখা যায় তার মধ্যে শুধু শাড়ী, চোলি (ব্লাউস জাতীয় অঙ্গাবরণ) ইত্যাদি নয়; ওড়না বা মস্তকাবরণের উল্লেখ বহু কাব্যে রয়েছে :

উত্তম উড়নী দিয়া সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া।
তাতে যথ লিখিয়াছে শুন মন দিয়া।।[৩৩]

পর্যটক ফেইশিনের বিবরণে এর সমর্থন মেলে। 'মেয়েরা খাটো জামা পরে, তার চারদিকে সূতী, রেশম বা কিংখারের ওড়না জড়ায়।'[৩৪] পর্যটকের এ-বর্ণনা সম্ভবতঃ সাধারণ ঘরের মেয়েদের নয়, বিত্তশালীর। সে যুগের নারীর পোশাকের মধ্যে ছিল চোলী বা চুলী

রঙ্গীণা সাটিনের চুলী আর নাকের নথ
আমিনা রাইখ্যা গেছে দোন কানের বালি।[৩৫]

"সাধারণ ভদ্রমহিলারা এবং নিম্ন-সমাজের স্ত্রী-লোকেরা একবস্ত্র প'রে থাকত এবং মাথায় ঘোমটা দিত"।[৩৬] কবি সর্বানন্দের সময়ে 'বিদগ্ধ স্ত্রীরা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর গণিকারা অন্তর্বাস পরত 'চণ্ডাতক'। 'উপলনী' ছিল অঙ্গরাগ লেপ। চোখে দিত কাজল। কপালে চন্দনের পত্রলেখা, তার মাঝে মাঝে 'কালিআ'---অর্থাৎ হলদে রঙের ফোঁটা। নীচু ক'রে চুল বাঁধলে হত 'খোপ্যক' অর্থাৎ খোঁপা, আর মাথার উপর উঁচু ক'রে বাঁধলে হ'ত 'ঘোড়চূড়' বা ঘোড়াচুলা।[৩৭] 'ঘোড়াচুলা'কে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ 'গোষ্ঠচূড়া' ব'লেও অভিহিত করেন। 'ঘোড়াচুলা' কায়দায় তখন পুরুষেরও কেশবিন্যাস হ'ত ব'লে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে জানা যায় :

কাহ্নাঞি তোর মান ধরে সকল ঋষি।
মাথে ঘোড়াচুল (হাথে) মনোহর বাঁশী।।[৩৮]

সওয়াল সাহিত্যের (১৮শ শতাব্দী) নায়িকা মল্লিকার পোশাকের মধ্যে রয়েছে 'শাল', 'পাটবস্ত্র' ও 'কিম্মিজ' (কামিজ) :

কেহ শাল অঙ্গেতে টানি।
কেহ পাটাম্বর খানি।
কেহ নানা কিম্মিজ টালনি।[৩৯]

'শাড়ী'র খুব বেশী উল্লেখ আদি-মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নেই। বৈষ্ণব-কাব্যে নীল-শাড়ীর শোভায় যেমন কবিরা আত্মহারা হয়েছেন, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর খুব কম কবির কাব্যেই তেমন বর্ণনা পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে কবি জ্যোতিরীশ্বর তাঁর বর্ণরত্নাকরে 'লক্ষ্মীবিলাস', 'দ্বারবাসিনী' ইত্যাদি 'পট' ও 'নেত'-বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার পরিধেয় ছিল 'নেতবাসী'।[৪০] ডক্টর তমোনাশ গুপ্ত প্রাচীন বাংলা কাব্য-দৃষ্টে তাঁর গ্রন্থে বাঙ্গালী নারীর যে-সমস্ত প্রিয় শাড়ীর উল্লেখ করেছেন[৪১] তার মধ্যে 'মেঘডুম্বুর', 'গঙ্গাজল', 'ময়ূর পেঁখম শাড়ী', 'আগুন-পাটের শাড়ী' ইত্যাদি প্রধান। কবি আবদুল হাকিমের (সপ্তদশ শতাব্দী) কাব্যে 'কনক ঝিনারী' (সোনালী আঁচল বিশিষ্ট) বস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে—কিন্তু 'শাড়ী'র কথা কবির কোন কাব্যে পাওয়া যায় না। এ'বিষয়ে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কোন এক অজ্ঞাত কবির রচনার উল্লেখ করেন (সম্ভবতঃ ইনি বাঙ্গালী ছিলেন)। পূর্ববঙ্গের মেয়েদের বেশ-বাস বর্ণনায় এই কবি বলেন :

বাসং সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়ো কাঞ্চন চাঙ্গদশ্রীর
মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃনৈ গন্ধ তৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নব শশিকলা নির্মল তালপত্রং
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনাম্।

(দেহে সূক্ষ্ম বসন, বাহুতে সোনার তাগা, মাথার উপরে গন্ধ-তৈলসিক্ত কেশজাল মসৃণ ক'রে আঁচড়ানো এবং চূড়ার মত খোঁপা বাঁধা, তাতে ফুলের মালা জড়ানো, কানে নূতন চন্দ্রলেখার মত কচি তালপাতার দুল—বঙ্গবারাঙ্গনাদের এই বেশ কার না মন হরণ করে?)

শাড়ীর আরও বিভিন্ন প্রকার নাম সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে প্রচলিত ছিল :

জরি জরকশী শাড়ী পাটাম্বর
সুন্দর শরীর মাঝে বিরাজে সুন্দর।[৪২]

অবসর-যাপন, বিনোদন, অধর-রঞ্জন করবার জন্য তাঁরা তাম্বুল-চর্চা করতেন নিঃশ্বাস সুবাসিত করবার জন্য পানের সংগে কর্পূর যুক্ত হতো :

আগর চন্দন চুয়া কর্পূর তাম্বুল গুয়া।
কেহ হরিষে জোগায়।
গোলাপের জল বারি　　সোহাগ মেলিআ মারি
কেহ কার বসন তিতায়।।[৪৩]

এ-যুগে আমরা মুক্তার মত সাদা দাঁত সৌন্দর্যের অঙ্গ ব'লে মানি। কিন্তু সে-যুগের কাব্যে দাঁতের মধ্যে কালো দাগ নারীর শোভাবর্ধন ক'রত বলে বর্ণনা পাওয়া যায় :

মার্জিত মঞ্জনে দন্তমধ্যে কালো রেখা।
মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা।।[৪৪]

অবরোধ, পর্দা ও জীবিকা

ঐতিহাসিকদের মতে—প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্ভ্রান্ত সমাজে অল্প-বিস্তর পর্দা-প্রথা বর্তমান ছিল।[৪৫] মধ্যযুগের ও প্রাচীন বাংলা কাব্য-দৃষ্টে ধারণা হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দা-ব্যবস্থা কিছু শিথিল ছিল। কারণ, ময়নাকে দেখছি "হাটে গ্যাছেন বাজারে গ্যাছেন, কিনিয়া খাইছেন খই।"[৪৬] সে-যুগের বাংলা কাব্যের কাহিনী বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করি, মেয়েরা জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্মে অবাধে বহির্গমন করতেন। উদ্ভিন্ন যৌবনা রাধাকে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে দেখি 'বড়াই'সহ দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রয়ের কাজে বাইরে যেতে। তাঁর দুধ-দৈ বিক্রয়ে বিলম্বের জন্য তিনি শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনা লাভ করেছিলেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে লক্ষ্য করা যায় যে গোয়ালিনীর জীবিকা অর্থকরী বৃত্তি ছিল।[৪৭] এ-ছাড়া, ব্যাধ-নারীদেরও প্রধান কাজ ছিল স্বামীর শিকার বা পশুপাখীর মাংস ঘরে ঘরে বিক্রী করা। 'ফুল্লরা' রূপ বা আভিজাত্যের গুণে কালকেতুর স্ত্রী হবার গৌরব লাভ করেনি—তার [illegible] গুণ ছিল বুদ্ধিমতী পশারিণী হওয়ার গুণ:

কিনিতে বেচিতে ভাল জানএ পশরা।[৪৮]

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে দেখা যায়, গৃহ-পরিচারিকা বা দাসীরা দায়িত্বপূর্ণ হিসাব-নিকাশের কাজেও কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দুর্বলা-দাসী এমনি একটি চরিত্র। হাটে গিয়ে বড় বড় খাসী বা বড় বড় মাছ থেকে শুরু করে পুঁইডগা, ফুলবড়ি, সবই কিনেছেন তিনি নিজে।[৪৯] কবি আবদুল হাকিমের 'লালমতী সয়ফুলমুলুক' কাব্যে পুষ্পচয়িকা 'পদ্মা' রাজপুত্র সয়ফুলমুলুককে খাওয়ানোর জন্য মাত্র একটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে অনেক কিছু কিনতে হাটে যান:

স্বর্ণের মুদ্রা পাই হরিষ মালিনী।
রাজ উপহার দ্রব্য সব আনে কিনি।।[৫০]

সে-যুগের অবরোধ-প্রথা বিষয়ে খুল্লনার অজা-চারণার প্রসংগ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৫১] পাঠক হয়তো বলবেন—সপত্নী কর্তৃক খুল্লনার প্রতি এ'বিধান শাস্তিস্বরূপ অর্পিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, তরুণীদের জন্য না হোক্, প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধার জন্য বাড়ীর বাইরে গমনাগমন প্রাচীন বঙ্গসমাজে প্রথাসিদ্ধ ছিল; নতুবা, সপত্নী লহনা তাকে ঘরের চার দেয়ালের বাইরে গিয়ে শাস্তি গ্রহণের আদেশ দেবেন কেন? গৃহাঙ্গনের মধ্যে তাঁকে অন্তরীণ রেখেও ভিন্নতর শাস্তি প্রদান করতে পারতেন।

ভারতচন্দ্রের হীরামালিনীর হাট-গমনের এবং বেসাতি-ক্রয়ে অবাধ গমনাগমনের চিত্র যেমন রয়েছে, তেমনি তার বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় রয়েছে:

দর করে এক মূলে জুখে লয় দুনা তুলে
ঝকড়ায় ঝড়ের আকার।[৫২]

আবার, ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী শুধু কেনাবেচায় পারদর্শী ছিল না, দৌত্যকর্মে সিদ্ধ বলেও কাব্যে তার বিবরণ রয়েছে। সম্ভ্রান্ত নারী-সমাজে, যুদ্ধক্ষেত্রে, পুরুষের বেশে যুদ্ধ করবার উদাহরণ বঙ্গ-বীরাঙ্গনা সখিনার জীবনালেখ্য থেকে জানা যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসেও এমন উদাহরণ রয়েছে। নবাব আলীবর্দী খানের স্ত্রী শরফুন্নেসা বেগম যুদ্ধের সময় স্বামীর পার্শ্বে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৫৩] গোলাম হোসেন সেলিমের রিয়াজ-উস সালাতীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায়—বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে মেয়েদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না।[৫৪] হিন্দু সমাজেও পর্দা রক্ষা করা হ'তো শুধু আভিজাত্য রক্ষা বা বিত্ত-প্রদর্শনের নিমিত্ত।[৫৫] সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যে 'বোরখা' শব্দটির কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'বোরখা' প্রথার উদ্ভব হয়েছে বাংলাদেশে, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। এ-ছাড়া, পরপর বৈদেশিক (ফিরিঙ্গী, জলদস্যু, মঘ, বর্গী ইত্যাদি) হামলার ফলে মেয়েদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয় এবং তাঁরা তখন থেকে গৃহকোণে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। তবে, বিভিন্ন কাব্যে সে-যুগের মেয়েদের কাজ-কর্মের উল্লেখ থেকে জানা যায়—গৃহস্থালি এবং সন্তানপালনের দায়িত্ব পালনের পরও অধিকাংশ নারী পুরুষের সংগে জীবিকা-নির্বাহের কাজে কোনো না কোনো ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ঐতিহাসিক Orme এবং অন্যান্য গবেষকদের তথ্য অবলম্বনে 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' প্রণেতা বলেন :

> The women spin the finest thread designed for the Muslin cloths and then deliver it to the men, who have fingers to model it is exquisitely as those who have prepared it...the ornamental work on the 'Kasida' (a kind of fine Muslin) cloths was knitted by hand on a pattern, which was stamped on the cloth and it was done almost entirely by women, most of whom were Muslims.[৫৬]

ডক্টর আহমদ শরীফের মতে 'জোলা, বেদে প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর দেশজ মুসলিম মেয়েরা পর্দা মানত না, তারা 'পুরুষের সংগে গোত্রীয় পেশায় যোগ দিত'।[৫৭]

যে-সমস্ত বয়সের মেয়েরা 'মসলীন' তৈরীতে অংশগ্রহণ করতেন তাঁদের মধ্যে আঠারো থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যবর্তী তরুণীর সংখ্যা অধিক ছিল।[৫৮] এ'কাজে মেয়েদের সহজাত দক্ষতা বা নারীসুলভ প্রবণতার বিষয়ে নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন : 'সূক্ষ্ম কার্যে মেয়েদের ধৈর্য, সতর্কতা ও সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির প্রয়োজন এবং সেজন্যই "তাঁদের কোমল করস্পর্শে টাকুয়ার অগ্রভাগ হইতে যেন মন্ত্রবলে মসলিনের সূক্ষ্মতন্তু উত্থিত হইত"।[৫৯] ধারণা হয় যে, বয়নশিল্পে বাঙ্গালীর সক্রিয় অংশগ্রহণ রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাল থেকে প্রচলিত হ'য়ে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ছিল। কবি খোয়ী'র (দ্বাদশ শতাব্দী) বরাত দিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন বলেন :

> সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র মমল্ল (মলমল) পরা মেয়েদের মধ্যেই চলত। সে-কাপড়ের সূতা তারা নিজেরা পাকাত। নির্ধন ব্রাহ্মণ বাড়ীর মেয়েদেরও এই কাজ করতে হ'ত।[৬০]

প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার কাজ নিষ্পন্ন ক'রতে প্রতিটি পদক্ষেপে পুরুষদের নর্ম-সঙ্গীমাত্র না হ'য়ে, সক্রিয়ভাবে পরিবারের আয়ের অঙ্ক বৃদ্ধিতে সহায়তা করবার এই প্রথা বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতির সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাহাড়পুরের কোন এক 'টেরাকোটা' শিল্পে তাই লক্ষ্য করা যায়---শিকার হাতে বঙ্গনারীর সুন্দর প্রতিচ্ছবি।[৬১] খেয়া-পারাপারের কাজে মহিলা-পাটনীর কথা এক কাব্যে রয়েছে। যেমন :

কালুয়া ডোমের নারী গৌরী নাম তার।
খেয়া নাও পাতিয়া শিবেরে করে পার।।[৬২]

মহিলা-মাঝি বা 'পাটনী' অন্যান্য বাংলা কাব্যেও বিরল-দৃষ্ট নয়। এ'ছাড়া, রজকিনীর জীবিকায় 'রামী', দৌত্য-কর্ম বা ঘটকের কাজে 'হীরা মালিনী' (ভারতচন্দ্র), 'হেতুবতী' (লায়লী-মজনু, দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান), বড়াই (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড়ু চণ্ডীদাস) ইত্যাদি চরিত্র যথেষ্ট বাক্-কুশলতা, ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। 'ঝুড়ি', 'চুপড়ী' প্রভৃতি তৈরী এবং বিক্রী করে সে-যুগের মেয়েদের জীবন-নির্বাহ হতো :

ধুচনী চুপ্‌ড়ি বুনি আর বুনি কুলা।
সেচনী ব্যজনী বুনি আর বুনি ডালা।।[৬৩]

অথবা—

ভালমন্দ নাহি জানি ভাতারের ভাত।
ঝুড়ি পেড়ি চুপ্‌ড়ি বুনিতে গেল হাত।।[৬৪]

সে-যুগে রজকিনীর পেশায় নারীরা অভ্যস্ত ছিল---'মনসামঙ্গলে'র কবিরা তার উল্লেখ করেছেন :

পুকুরেতে বস্ত্র ধোয় ধোপার কুমারী।[৬৫]

বিনোদন ও অবসর

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ বলেন—"বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার স্নানের সময় অন্তঃপুরের মেয়েরা মঙ্গলসূচক শুভধ্বনি করিত। হাতে প্রদীপ লইত, মাথায় কলসী বহিত, নাচিত, হাসিত, গান করিত, করতালি দিত, ঘাট হইতে জল লইয়া সিঞ্চন করিত, পান-সুপারির শ্রাদ্ধ করিত, আনন্দে ধামালী (অশ্লীল গান) গাহিত ও নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত হইত"।[৬৬]

আনুষ্ঠানিকভাবে সে-যুগের মেয়েরা সকলে বাদ্যগীত না করলেও কবিদের বর্ণনা থেকে জানা যায়—কুল-নারীরাও রঙ্গকৌতুক এবং নাচগান করতেন।[৬৭] কবি আবদুল হাকিমের কাব্য পাঠে জানা যায় বিবাহ-অনুষ্ঠানে 'সহেলা' বা মেয়েলী-গান, রঙ্গরস-পূর্ণ নটীদের নাচ ও আনন্দ-গীতিকা, চন্দন ও আবীর-খেলা মেয়েদের উপভোগ্য ছিল :

সুবর্ণ কটোরা ভরি প্রতি জনে হস্ত ধরি
চন্দন ছিটায় চারিপাশ।
আবীরে ভরিয়া বাটি নিত্য করে ছিটাছিটি
লালমতী বিবাহা উল্লাস।
সখীগণ লই সংগে জয়ঢোল বাজে রঙ্গে
মুখে পুরে নানা বাদ্যগীত।
যথেক রমণী মিলি মনরঙ্গে হুলাহুলি,
অন্তঃপুরে মন হরষিত।।৬৮

পূর্ববঙ্গের বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে আর এক প্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রীড়া প্রচলিত ছিল, যেখানে বর-কনে অংশগ্রহণ করতেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মহিলারা। বিবাহের অনুষ্ঠানে "দু'পক্ষের সখী, বন্ধু ও আত্মীয়ের উপস্থিতিতে নানা রঙ্গরসের ব্যবস্থা থাকত--তার নাম 'জুলুয়া' বা 'জোলুয়া'। এ'সময়ে বর-কনের মধ্যে পাশাদি ক্রীড়ারও ব্যবস্থা হ'ত, এর নাম 'গেরুআ' খেলা এবং বর-কনের অন্য বাড়িতে অভ্যর্থনাও হ'ত"।৬৯ 'গেরুআ' ও 'জোলুয়া' খেলার বর্ণনা কবি শেখ সাদী'র (অষ্টাদশ শতাব্দী) 'গদা মল্লিকা সম্বাদ' কাব্যে দেখা যায়:

যথ আছে শাস্ত্রেত খুতবা পড়াইল তত
জুলুয়া দিলেন্ত তার শেষে
দেখিয়া মালিকার মুখ আলিমের মনেত সুখ
পুরিলেক মনের বাঞ্ছিত।৭০

সে-যুগের মেয়েদের অধিকাংশ প্রমোদ-চিত্র র'য়েছে বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনায়। বরের সংগে হাস্য-রসিকতা ক'রে মেয়েরা প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার আনন্দে মেতে উঠতেন। শুধু বাক-যুদ্ধ নয়, রসিকতা ও বিদ্রূপের খাতিরে বরের অঙ্গে চপেটাঘাত করতেও তাঁরা সঙ্কোচ বোধ করতেন না:

বসনে বরের মুখ ঢাকে সব সখী।...
নিছিয়া ফেলিল পান উত কর তুলি।
বরেরে ফেলিয়া মারে মগুড় (মুগুর) চাউলি।।
চারি চক্ষু চঞ্চল চাহিল কন্যা বরে।
কামিনী সকল তায় কত রস করে।।৭১

রাজার বাড়ীর বিবাহ-উৎসবে সমস্ত সখী-সহচরী রং খেলত রাজা-বাদশাহ্‌র সামনে:

অধরে মধুর হাসি অমৃত সঞ্চার।
নৃপগণ সম্মুখে করেন্ত নানা কেলি।
কেহ কাক কৌতুকে আবীর মারে মেলি।

গোলাব দেঅএ কেহ বসনে কাহার।
কেহ কার গলে দেয় কুসুমের হার।[৭২]

কবি দোনাগাজী (সপ্তদশ শতক) বিরচিত সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যে 'গেরুআ' খেলার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় :

বিভার মঙ্গল সখী রাজ ব্যবহার।
সুবর্ণ গেরুআ হাতে নৃপতি সবার॥
নবীন রূপসী শশী পূর্ণ শশী কলা।
অধরে মধুর হাসি মদন কুশলা॥
কাব্যের কোমল বাণী অমৃতের ধার।
চন্দন ছিটন মত রস ব্যবহার॥
হাসন দশন জুতি চমকে চপলা।
সুবর্ণ গেরুআ রাসা অঙ্গে মেলা।
রজনী পোঞাএ সুখে গেরুআ খেলিয়া।[৭৩]

বাদ্য ও নৃত্যগীত মেয়েদের উপভোগ্য ছিল। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তাঁরাও নাট-এ অংশগ্রহণ করতেন :

উচ্চরব দামা সব গর্জিত আকাশ।
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস।
শানাই বিপুল বাজে বিউর কন্নাল।
অনেক মধুর বাদ্য বাজএ বিশাল।
অবলা সুন্দরীগণ সুবেশ উত্তম।
কৌতুকে করএ নাট অতি মনোরম॥[৭৪]

"কন্যাসজ্জার সময় সখী ও সমবয়স্কের মধ্যে রঙ্গরস-পূর্ণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ জ'মে উঠত। মাঝে মাঝে তাঁরা মেয়েলী গান গেয়ে উৎসবের পরিবেশকে আনন্দমুখর ক'রে তুলতেন। এ'জাতীয় মেয়েলী গীতকে পূর্ববঙ্গে 'সহেলা' (সহলা = হঅলা = হ'লা)"[৭৫] বলা হ'তো :

কুমারীক চারিদিকে করিলা মাতলি।
কেহ কেহ সহেলা গায়ন্ত মনোরঙ্গে।
উপটন দিয়া কেহ কুমারীর সংগে।
কেহ কেহ দুষ্ট রঙ্গে দিলেক ভুলাই।
কেহ কেহ বলে ছলে দেয়ন্ত গোছল।
যতনে পৈরায় কেহ সুরঙ্গ অম্বর।[৭৬]

পঙ্কজল, পঙ্ক-নিক্ষেপ বা পাঁক-ছোঁড়াছুড়ি সে-যুগের তরুণীদের একটি ক্রীড়া ছিল। একটি কাব্যে এর বিবরণ পাওয়া যায় :

লক্ষ লক্ষ সুন্দরী করএ নানা কেলি।
অন্যে অন্যে দুই জনে করে মিলামিলি।
পঙ্ক জল আনি কেহ পঙ্ক লৈয়া হাথে।
পঙ্ক মেলি মারে সব পঙ্কজ সভাতে।[৭৭]

সে-সমাজে উন্নত যান-বাহনের ব্যবস্থা না থাকায় সামাজিক মেলামেশা বজায় রাখা পুরুষ অপেক্ষা নারীর জন্য ব্যয়বহুল এবং কষ্টায়ত্ত ছিল। তাই, তাদের অবসরযাপন প্রধানতঃ গৃহাঙ্গনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু মেয়েদের চিত্ত-বিনোদনের ক্ষেত্রে যে সুযোগ-সুবিধাদি একেবারে সীমিত ছিল না, তার আরও পরিচয় পাই পুকুরে স্নানের সময় সখী-সম্মেলনে। এ-সমস্ত সখী-সমাবেশে, স্নান-কালে, এক কোলাহল-পূর্ণ মেয়েলী-আন্তরিকতা এবং রহস্যালাপের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে বর্ণনা করা যাক কবিকঙ্কণের কাব্যের নিম্নে বর্ণিত চিত্রটি। জলক্রীড়ায় তাঁরা যেন মৎস্যের বা হংসের জল-বিহারের আনন্দ লাভ করতেন :

কেহ হাসে কেহ গায় কেহ গড়াগড়ি যায়
কেহ নাচে দিয়া করতালি।
কেহ বা লুকায় কোলে কেহ তারে ধর্যা তোলে
শিরে তার দেয় জল ঢালি।।...
দেখিয়া জলের ক্রীড়া কুলবধূ জন বুড়া
মদন মঙ্গল গীত গায়।
কুলবধূজন মেলি জল খেলে কুলি কুলি
লাজ পায়্যা পুরুষ পালায়।।[৭৮]

সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি দোনাগাজীর কাব্যেও বঙ্গ-অঙ্গনাদের অনুরূপ স্নানানন্দ, গাত্র-মার্জনা ও সাঁতার-উপভোগের বর্ণনা রয়েছে। নদী ও নারীতে মেশামেশির এই চিত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ :

পুরীর পুষ্করিণী সব পুষ্প জলে পুরি।
কেলি করে সুন্দরী সবে তাহাত সাঞ্চরি।
হংস মত ভাসে কিবা মাতঙ্গ গামিনী
মৃগমত চলে কিবা কুরাঙ্গ নয়ানী।
কেহো ঝাম্প দিয়া পড়ে আপনার রসে
কেহো কারে ঠেলি ফেলে কৌতুকের বসে।
কেহো কারে করে ধরি জলেত নামাএ
কেহো কারে জল ছিটি বসন ভিতাএ।
কেহো শীতে অতি কম্পিত অবলা
রসে যেন অক্ষিএ লক্ষিতে নারে লীলা

কেহ কারে দেখাইয়া মারে জলছিটা।
শশী বেষ্টিয়া খেলে তারা গোটাগোটা ॥[৭৯]

সে-যুগের বালিকা বা কিশোরীরা 'বাঘাবন্দী', 'ছি-বুড়ী' প্রভৃতি 'চলতি খেলা'য় যেমন পাড়া মাতিয়ে তুলতেন, তেমনি, ঘরের আঙ্গিনায় নানা ধরনের ক্রীড়ামোদে জীবন-সম্ভোগের আনন্দলাভ করতেন। ধূলি, ফুল, পাতা বা কাদামাটি দিয়ে মিছামিছি 'রান্না-বান্না' খেলায় বা 'বনভোজনে' ছোট ছোট মেয়েদের আনন্দ উপভোগের কথা কবিকঙ্কণ[৮০] এবং কবি রামেশ্বর (সপ্ত শ শতাব্দী) তাঁর 'শিবায়ণ' কাব্যে বর্ণনা করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তার উদ্ধৃতি দেয়া গেল না।

নারীমহলের অবসর বিনোদনের আরও চিত্র পাওয়া যায় প্রাচীন বাংলা কাব্যে। নিম্নের বর্ণনায় দেখা যায় সুকোমল উপাধানে তাঁরা হস্ত-পদ প্রসারিত ক'রে, অবসর-যাপনের সময়ে তাম্বুল সেবন করতেন এবং সুবাসিত ভৃঙ্গারের পানিতে শরীর জুড়াতেন। বিছানার উপরে শোভা পেত ফুলের চাঁদোয়া :

আশে পাশে গির্দা (বালিশ) দিল শিয়রে বালিশ।
সুবর্ণের বাটাতে দিল তাম্বুল ভরিয়া ॥
সুবাসিত জল লৈল ভৃঙ্গার ভরিয়া।
উপরে টানায়্যা দিল ফুলের চাঁদোয়া ॥[৮১]

পতিভক্তি ও দাম্পত্য-সম্পর্ক

এ'দেশের নারীর চরিত্রে পতিভক্তির যে অন্ধ-আবেগ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা দেখেছিলেন—তা' অনেক সময় বিদেশীর দৃষ্টিতে অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। বিশেষ ক'রে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারীর আচরণে, মাঝে মাঝে, যে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হ'য়েছে তা' কৌতুকপ্রদ। এমনি ঘটনার বিবরণ এখানে উল্লেখ করা যায় :

> জনৈক মহিলা তার ঘুমন্ত স্বামীর মাথাটি শীতের জন্য আপন কোলে রেখে অগ্নিতাপে শরীর গরম করছিল। হঠাৎ, তাদের একমাত্র সন্তানটি হামাগুড়ি দিয়ে আগুনের কাছে এগিয়ে গেল। স্বামীর সুপ্তিভঙ্গের আশঙ্কায় পতিপ্রাণ-গত স্ত্রী স্বামীর মাথাটি ফেলে দিয়ে সন্তানকে আগুন থেকে রক্ষা করার কথা কোনোক্রমে ভাবতে পারলো না। বরং সে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে, ঐ অবস্থায় ক্রোড়স্থ স্বামীর মস্তকখানি পূর্ববৎ শায়িত রেখে, সন্তানকে বাঁচানোর জন্য স্রষ্টার প্রতি প্রার্থনা জানাল। আশ্চর্যের ব্যাপার, অগ্নিদেবতা তুষ্ট হ'য়ে তাদের শিশুকে রক্ষা করলেন এবং শিশুটি হাসতে লাগলো।[৮২]

এ'রকম পতিভক্তি যদিও অবাস্তব এবং অতিরঞ্জিত—তথাপি দাম্পত্য-জীবনে এ' জাতীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রাচীন বাংলা কাব্যে বিরল নয়। কবি উমাপতি ধর

দ্বাদশ শতাব্দী) তাঁর 'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থে বলেছেন, "স্ত্রীর পিতা প্রভৃত বিত্তশালী এবং স্বামী দরিদ্র হ'লেও বাংগালী নারীর কাছে পুত্র এবং পিতা অপেক্ষা স্বামীই বেশী প্রিয়"।৮৩

স্ত্রীর সংগে স্বামীর সম্পর্ক বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি আলাওল বলেছেন:

পুরুষ অর্ধাংগ নারী বিধু নিয়োজিত।...
রমণী শরীর জান পুরুষ জীবন।
জীবন-রহিত অংগ কোন্ প্রয়োজন।৮৪

এ'দেশের নারী-প্রসঙ্গে মুহম্মদ আকিলের (আ. সপ্তদশ শতাব্দী) মনোভঙ্গী আরও জীবন-সম্পৃক্ত:

শরীরের অর্ধ অংগ ঘরের রমণী।
দুই হস্তে দুনিয়াতে ভাবের ভাবিনী।
নারী না থাকিলে পুরুষ কিছু না হয়।৮৫

সুগৃহিণী বিষয়ে কবি রামেশ্বর (সপ্তদশ শতাব্দী) বলেন:

গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।
ফেল্যা দিয়া পুরুষ পাশরে সে কি জানে।
পুণ্যবান লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।
উত্তম উদ্‌যোগ কর্যা উথলয়ে গারি।।
অভাগার ঘরে আসে অলক্ষুণ্যা মাইয়া।
লক্ষ্মার বাণিজ্য যদি আইন্যা দ্যায় ঘরে।
মাইয়া হলো উড়ই উড়াই আঁখি ঠারে।।৮৬

আশৈশব-স্নেহে লালন ক'রে সর্বপ্রকার গার্হস্থ্য রীতি-নীতি ও ধর্ম-শিক্ষা দি'য়ে সে-যুগে বাঙ্গালী জনক-জননী যখন জামাতার হাতে মেয়েকে তু'লে দিতেন—তখন তাঁদের একমাত্র উপদেশ ছিল পতিসেবা:

পতি বিনে সতীর নাহিক গুরুজন।
দোঁহ জগে সুখ মুক্তি যেহ সেবে স্বামী।
কদাপিহু রিষ গর্ব মনে না রাখিবা।
প্রেমভক্তি সেবা মাত্র আচরি রহিবা।।৮৭

অথবা—

স্বামীর দোসর প্রভু মান্য করে নারী।
পুরুষে জানিব স্ত্রী প্রেমের ঈশ্বরী।
কুপুরুষে নারী প্রেম না রাখএ নিত।
সুপুরুষে নারী সংগে সদায় পীরিত।।৮৮

আবার, ভালবাসা এক তরফা হ'তে পারে না। প্রেম সর্বদা প্রত্যাশার পথ চেয়ে ব'সে থাকে। তাই, জামাতার প্রতি মাতার একমাত্র মিনতি :

বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কইর্যো তুমি।
হাঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভইর্যা ভাত।
প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ ।।৮৯

কিন্তু, মধ্যযুগের বাঙ্গালী-বধূর স্বামী ছাড়া আর কোন ভাবনা বোধকরি ছিল না :

তোর সংগে দুক্ষ সুখ দুই প্রাপ্য মোর।
পরিচর্যা করিয়া সেবিমু পদ তোর ।।৯০

স্বামী-পুত্র বা জামাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতি গৃহিণীর বিশেষ লক্ষ্যপাত ছিল। এ-কর্তব্য ছিল নারী-ধর্মের অঙ্গীভূত :

নারী প্রতি কর্ণচ্ছেদ শত গুণে ভাল।
বিরসবদন পতি দেখিতে জঞ্জাল ।।
যে নারী রাখিতে নারে পতি কুতুহলে।
যে নারী দহিবে প্রভু নারক আনলে ।।৯১

বহু-বিবাহ প্রচলিত থাকায় অধিকাংশ ঘরে একাধিক উপপত্নী থাকত। সপত্নীর আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে, স্বামীকে আপনপ্রিয় করবার জন্য তাঁরা কত সাধ্য-সাধনাই না করতেন। ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী[৯২] দেহসজ্জা বা অঙ্গরাগের পরিবর্তে মন্ত্র-বিশ্বাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। প্রায় প্রতিটি সংসারে নারীর অবস্থান পুত্র, ভ্রাতা বা স্বামীর অস্তিত্বের সংগে জড়িত ছিল। হিন্দু সধবারা এয়োতির লক্ষণ-স্বরূপ এক গাছি লোহা ধারণ করত ('আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি')[৯৩]। স্বামীর অবর্তমানে হিন্দু বিধবাদের সাজসজ্জা দূরের কথা, হাতে কঙ্কণ-চুড়ি ইত্যাদি আভরণ-গ্রহণও প্রথাসিদ্ধ ছিল না। ঘনরাম বলেন :

করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কপালে সিঁদূর।
নারীর নিশান রেখে করে বেশ দূর।৯৪

বিবাহিত নারীর স্বামী যা'তে অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট না হ'ন, স্ত্রী সে-উদ্দেশ্যে যাদু-টোনার আশ্রয় নিতেন :

খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকন শাড়ী
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।
পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া ফুল চুলে রাখি
নানামন্ত্রে সিঁদূর পরিলা।৯৫

কবি দৌলত কাজী (সপ্তদশ শতাব্দী) তাঁর 'সতীময়না' কাব্যে ধাত্রীর জবানীতে প্রায় এ'জাতীয় পরামর্শই নায়িকাকে দিয়েছিলেন :

কাজলে উজ্জ্বল কর কমল নয়ান।
দৃষ্টিতে ভুলএ জেহ্ন অবোধ বামন।।
নবঘন জ্যোতি কেশ কুসুমে জড়িয়া।
তাহাতে বামনচিত্ত রাখহ বান্দিআ।।
কর্ণপুটে রত্নময়ী পৈর অলঙ্কার।
দেখিতে বামনচিত্তে লাগে কামভার।
কস্তুরী তিলক মুখে মৃগাঙ্ক সে ছন্দে।
বামন চকোর জেহ্ন দেখি পড়ে ফান্দে।।[৯৬]

পরনারীকে সে-যুগের আদর্শ পুরুষরা মাতৃসম-জ্ঞান করতেন ব'লে এক কবি (ত্রয়োদশ শতক) বর্ণনা করেছেন :[৯৭]

"মাতেো বাসীৎ পরস্ত্রীভবতি পরধনে ন স্পৃহা যস্য পুংসো মিথ্যাবাদী ন যঃ স্যান্ন পিবতি মদিরাং প্রাণিনো যো ন হন্যাৎ/মর্যাদা ভীরু: সকরুণ হৃদয়স্ত্যক্ত সর্বাভিমানো ধর্মাত্মা তে স এষ প্রভাবতী ভগবান পাদ পূজাং বিধুধাতুম্"।

(রামচন্দ্র কবি-ভারতী : ভক্তিশতক)

(অর্থ : "পরস্ত্রী যার কাছে মাতৃসমা, যে-পুরুষ পরধনে নিস্পৃহ, যে মিথ্যাবাদী বা মদ্যপায়ী নয়, প্রাণী হত্যা করে না, মানীর মানভংগে ভীত থাকে, করুণা হৃদয়, যে নিরভিমান সে-মহাত্মাই স্রষ্টার পূজার অধিকারী"।)

অতিথি-পরায়ণতা ও রন্ধন-প্রিয়তা

জননী ও স্ত্রীর ভালবাসা প্রকাশের সম্ভবতঃ একটি উপায় সে-যুগে ছিল—পঞ্চ-ব্যঞ্জনের উপচার পুত্র অথবা প্রাণপতির সামনে তু'লে ধরা। অধিকাংশ মধ্যযুগের কবি নারীর রন্ধনকর্ম-নিপুণতা এবং রন্ধনকর্মে নারীদের পরিশ্রম ও আগ্রহের প্রশংসা করেছেন। ব্যঞ্জন, পিঠা-পায়েস ও মিষ্টির বহু-বিচিত্র বর্ণনায় দেখা যায়— রন্ধন-দক্ষতা সে-যুগের নারীদের গর্বের বস্তু ছিল। খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত ক'রতে তাঁরা অনেক পরিশ্রম, ধৈর্য এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন। প্রবাসী স্বামীর গৃহে প্রত্যাগমন-প্রত্যাশী বধূদের প্রতীক্ষার বর্ণনায় তাই আমরা দেখি :

আইজ বানায় তালের পিঠা কাইল বানায় খই।
ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে সামছা বান্ধা দই।।
শাইল ধানের চিঁড়া কত যতন করিয়া।
হাঁড়িতে ভরিয়া রাখে ছিক্কাতে তুলিয়া।।

এহি মতন খাদ্য কত সদিনা বানায়।
হায়রে পরাণের খসম ফিরয়া নাহি চায়।।
ভালা ভালা মাছ আর মোরগের ছালুন।
আইজ আইব বইল্যা রাখে খসমের কারণ।।৯৮

যে দিন সে নারীর প্রিয়জন গৃহে প্রত্যাগত, সে দিন তাঁর কাজ হ'ল নিজের সামনে বসিয়ে তাঁকে খাওয়ানো :

গামছা বাঁধা দই কন্যা যত্তনে পাতিয়া
উলায় খই দিয়া খাওয়ায় সামনে খাড়া হৈয়া।।৯৯

শুধু স্বামী নয়—আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সকলকে আহারে তৃপ্ত ক'রে, তাঁর নিজের জন্য কিছু অবশিষ্ট না থাকলেও গৃহিণীর মুখের হাসি যে শুকিয়ে যেত না—প্রাচীন কাব্যে তারও প্রমাণ পাওয়া যায় :

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দু'টি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি।।
তিনজনে একুনে বদন হৈল বার।
দু'টি হাতে গুটি গুটি যত দিতে পার।।
তিনজনে একেবারে বারমুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়।।
দেখ্যা দেখ্যা পদ্মাবতী বস্যা এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মুচ কইর্যা হাসে।।১০০

রন্ধন এবং পরিবেশনে সে-যুগের মেয়েরা যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ লাভ করতেন—তাঁর পরিচয় অনেক কাব্যেই পাওয়া যায় :

অনেকদিন পরে রান্ধে মনের হরিষে।
ষোল ব্যঞ্জন রান্ধিল নিরামিষে।।১০১

এ সমস্ত রন্ধনের বর্ণনা থেকে, সে যুগের বাঙ্গালীর খাদ্যবস্তুতে নিরামিষের প্রতি আসক্তি এবং প্রিয়-ভোজের বর্ণনাও পাওয়া যায়। প্রাকৃত-পৈঙ্গল ভাষার একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে : 'ওগ্গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা/মোইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা(ই) পুণবন্তা।। (ওপরা ভাত, রম্ভার পাত, গাইয়ের ঘি, দুগ্ধ-সংযুক্ত মৌরলা মাছ, নালিতা শাক—কান্তা দিচ্ছে, পুণ্যবান খাচ্ছে।)১০২

দেখা যায়—অল্পসময়ে, এক সংগে বিশ-ত্রিশটি ব্যঞ্জন রন্ধনের কৌশল সে-যুগের মহিলারা বয়োবৃদ্ধাদের কাছে থেকে আয়ত্ত করতেন। সময় এবং জ্বালানী বাঁচানোর জন্য গৃহিণীরা 'নয়মুখ, 'পঞ্চমুখ' অথবা 'তিনমুখ' বিশিষ্ট উনোনে রাঁধতেন। 'চণ্ডীমঙ্গল'

কাব্যে (কবিকঙ্কণ) আমরা দেখি—একটি মাত্র দাসীর সহায়তায় খুল্লনা একাকী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করেছিলেন।[১০৩] কবি জয়ানন্দ (ষোড়শ শতাব্দী) বলেন—'পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধিল কৌতুকে।'[১০৪] বিত্তশালী গৃহিণীরা দাসী বা কিঙ্করীর সাহায্য গ্রহণ ক'রতেন :

বিবিধ চাখে বাঁদী রান্ধে যথা।

সে-যুগের নারীদের বাজার, গঞ্জ বা হাটে নিজে গিয়েও বাজার সম্পন্ন করতে দেখা যায়। কবি আবদুল হাকিমের 'লালমতী' কাব্যে মালিনী পদ্মার নিজ-হস্তে রাজ-উপহার দ্রব্য কিনবার সংবাদ রয়েছে।[১০৫] স্বল্পবিত্ত নারীদের, অথবা দাসী বা গৃহ পরিচারিকার হস্তে পরিবারের সমস্ত কেনা-বেচার ভার ছিল ব'লে মুকুন্দরামের কাব্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক রন্ধনকে তাঁরা দুরূহ মনে করতেন না, পবিত্র কাজ ব'লেই মনে করতেন :

পতির আদেশ ধরি　　রান্ধেন খুল্লনা নারী
সোঙরিয়া সর্বমঙ্গলা।[১০৬]

তাঁদের কেউ কেউ রন্ধনের পূর্বে অঙ্গ-প্রক্ষালন, প্রার্থনা ও অগ্নি-প্রদক্ষিণ প্রভৃতি কাজ প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করতেন :

স্নান করিল গিয়া বণিক সুন্দরী।
রন্ধন করিতে যায় অতি তাড়াতাড়ি।।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বর দান।
মুঞি যেন রন্ধন করি অমৃত সমান।।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি চাপাইল রন্ধন।
ডান দিকে ভাত চড়ায় বামেতে ব্যঞ্জন।।[১০৭]

বিজয় গুপ্ত (১৫শ-১৬শ শতাব্দী) তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে রাঁধুনীর মনোযোগ ও পরিপাট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন—'রান্ধিছে রাঁধুনী না দেয় গা' মোড়া'।[১০৮]

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও রাধার অনুতাপ দেখা যায় 'রান্ধনের যুতী' (খেই) হারানোর জন্য।[১০৯] অন্য এক কাব্যে লক্ষ্য করা যায়—রন্ধনে বিশেষভাবে নিবিষ্ট সালঙ্কারা রাঁধুনীর অঙ্গসঞ্চালনের সংগে সংগে কর্ণাভরণের দোলাচল দৃশ্য কবির রসবোধকে উদ্দীপ্ত করেছে :

হাঁড়ির হেঁটে ব্যঞ্জন উপরে ভাসে ফেনা।
নাড়িতে নাড়িতে ন'ড়ে দু' কানের সোনা।।[১১০]

প্রাচীন কবির বর্ণনায় জানা যায়, রোগীর জন্য ভেষজ-ঔষধ মিশ্রিত বিশেষ প্রক্রিয়ায় খাবার প্রস্তুত করে গৃহিণীরা গৃহ-চিকিৎসকেরও ভূমিকা গ্রহণ করতেন :

জ্বরপিত্ত আদি নাশ করার কারণ।
কাঁচকলা দিয়া রান্ধে সুগন্ধ পাঁচন।।[১১১]

এ সমস্ত উদাহরণ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে—সে-যুগের নারীরা শুশ্রূষাকারিণীর বিভিন্ন গুণে গুণান্বিতা ছিলেন। সেবা-যত্নে, এমনকি রন্ধনেও সে-আন্তরিকতার পরিচয় দিতেন। যেমন :

মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পানগুয়া
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন চুয়া ॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বানাইয়া বান্ধব-চূড়া কুন্তল ভার ॥[১১২]

সমাজ-সেবা ও দান-দক্ষিণা

ধনী ও সম্ভ্রান্ত গৃহিণীরা দান-দক্ষিণা ও অতিথি-সেবাকে পুণ্য-কর্ম বলে মনে করতেন। কবি আবদুল হাকিমের 'লালমতী সয়ফুলমুলুক' কাব্যের সহ-নায়িকা রোকবানু সয়ফুল-মুলক-এর সন্ধানে এবং তার মঙ্গলকামনায় পান্থশালা নির্মাণ করেছিলেন। আপন অঙ্গের সমস্ত রত্নাভরণ বিক্রী ক'রে তিনি পথশ্রান্তদের কষ্ট মোচন এবং সমাজসেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন :

যথেক বিদেশী দেশান্তরী নরগণ।
আসিয়া আনন্দে সেবা বঞ্চে রঙ্গ মন॥
একশত মুদি খানা কর সারি সারি।
একশত কুম্ভ রাখ একশত ঝারি॥
অন্ন ইচ্ছিবারে জল করিবারে পান।
বিদেশী ভ্রমিক সব আসি এহি স্থান॥[১১৩]

গৃহভৃত্য বা দাসী-বাঁদীদের সংগে গৃহকর্ত্রীর হৃদয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতো। দাসী-বাঁদীরা দাম্পত্য জীবনের শান্তি কামনায় প্রভুপত্নীকে সৎ পরামর্শ প্রদান করত এবং বিত্তশালীর পত্নীরাও তাদের বুদ্ধি-পরামর্শ গ্রহণে দ্বিধা-বোধ করতেন না। ভবানন্দমজুমদারের দুই স্ত্রীর দুই দাসী 'সাধী' ও 'মাধী'র আনুগত্যের এবং আন্তরিকতার কথা[১১৪] এ-প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে।

বহু-বিবাহ, পণপ্রথা ও বৈধব্য

ঐতিহাসিকরা বলেন—বাংলাদেশের সে যুগে পুরুষের জন্য বহুবিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। কারো কারো মতে তা মুসলিম প্রভাবজাত; যদিও প্রাচীন-ভারতের আর্যসমাজ ব্যবস্থায় এ নিয়ম প্রচলিত ছিল।[১১৫] সে-যুগের বাংলা কাব্যে পুরুষের একাধিক বিবাহের উদাহরণ ভবানন্দ মজুমদার এবং চৈতন্য-শিষ্য নিত্যানন্দ। হয়তো সে-যুগের বঙ্গললনাগণ সে-প্রথাকে জীবনের অঙ্গ ব'লে মেনে নিয়েছিলেন। কারণ, কোন কোন পুরুষ বিশ্বাস করতেন—'দুই নারী নাহি বিনা পতির আদর'।[১১৬] কিন্তু অধিকাংশ বাংলা কাব্যে

আমরা এর বিপরীত চিত্র পাই। অধিকাংশ কাব্যে সপত্নীর প্রতি নারীদের অসহযোগিতা, ঈর্ষা ও বিরূপ-মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে:

নাহি কৈলা দয়া বাপে দিল বিয়া
দারুণ ছয় সতীনে
অল্প যে বয়স আন্ধার প্রবেশ
ছয় সতীনের ঘরে।[১১৭]

দরিদ্রের কান্তা শুধু নয়, রাজার রাণীও এ বেদনার জ্বালা অনুভব করতেন:

যে দুঃখ মোহোর পরে পড়িয়াছে ধাই।
সে দুঃখ পড়োক গিয়া সতিনীর ঠাঁই।।
মোহরা নন্দিনী চান্দ গোহারী সুন্দরী।
শীষের সিন্দুর মোর সেই নিছে হরি।।[১১৮]

বাংলাদেশের ভূমিপ্রাণ-সভ্যতার ঐ-পর্বে পুরুষের বহুবিবাহের একটি বড় কারণ ছিল। তা' সম্ভবতঃ কৃষিকার্য ও গৃহকর্মে দায়িত্ববণ্টনের প্রয়োজনীয়তা। কায়িক পরিশ্রমের গুরুদায়িত্ব বহন করতো পুরুষরা, কিন্তু মাঠের কাজ ব্যতীত, কৃষি-সংক্রান্ত সমস্ত গৃহাঙ্গনের কাজ একান্নভুক্ত পরিবারের মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে সম্পাদন করতেন।[১১৯] শ্রমশীল কাজে মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং স্বাস্থ্যরক্ষা হয় ব'লে উৎসাহব্যঞ্জক খনা'র বচনও রয়েছে:

যাহার ঘরে নাহি ঢেঁকি মুষল।
সে বহুঝি'র নাহিক কুশল।[১২০]

বিত্তশালী একটি কৃষকের কৃষিকর্মে সাহায্যের জন্য অধিক সন্তান এবং একাধিক স্ত্রী, দুইই পুরুষের কাম্য ছিল। আবদুস্ শুকুর মহাম্মদ বিরচিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' (আ. ১১শ-১২শ শতাব্দী) গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়—দুই বোনকে রাজা একসংগে বিবাহ ক'রে সুখে ঘর করছে।[১২১] বাল্যবিবাহ পুরুষ-নারী, উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় রাজা গোপীচন্দ্রের ও বড়ু চণ্ডীদাসের (আ. ১৫শ শতাব্দী) রাধার কথা। রাজা গোপীচন্দ্র, শ্রী চৈতন্য এবং কবি ভারতচন্দ্রও বিংশতি-বর্ষ পূর্ণ হ'বার পূর্বে দার-পরিগ্রহ করেছিলেন। নারীরা পুনর্বিবাহের সময় পূর্বস্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন।[১২২] কন্যার পিতৃগৃহে অবস্থান শুধু বিবাহ-পূর্ব যুগেই সমাজের দৃষ্টিতে আদৃত ছিল। কন্যা-সন্তানের জন্মের পর থেকে তার পিতামাতা যৌতুক দেবার জন্য সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুত থাকতেন। জমি-জমা, গরু—বাছুর, দামী আসবাব-পত্র গৃহসজ্জার উপকরণ, কৃষি-যন্ত্রপাতী, দাস-দাসী, খাদ্যবস্তু, তৈজস-পত্র, গহনা—প্রায় সবই কনের পিতামাতা প্রদান করতেন। কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ণ' কাব্যে যৌতুকের

তালিকায় সুভোজন, বসনভূষণ ও নানা দানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২৩] উপহার প্রদানে পিতামাতার চিত্তে গ্লানির পরিবর্তে উল্লাসের কথা প্রাচীন কবিরা আনন্দের সংগে প্রকাশ করেছেন :

তবে দিব্য ধন ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস।।[১২৪]

তবে, বরপক্ষকেও কনের জন্য পণ দিতে হ'ত :

বহুমূল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন।
প্রদীপ সমান দাস রুমী একশত।
শতেক হাব্‌সী দিমু যেন প্রতিপদ।।
দুইশত উট দিমু শতেক তুরঙ্গ।
পঞ্চশত বৃষ দিমু শতেক মাতঙ্গ।।[১২৫]

যৎসামান্য পণ বা যৌতুকের উদাহরণও মধ্যযুগের কাব্যে বিরল নয়।[১২৬] দ্বিজ মাধবের কাব্যে কনের পিতা বরের পিতার নিকট দু'খানি আটপৌরে শাড়ী মাত্র যাচ্ঞা করছে। সেখানে পণ্য-সামগ্রীর মতই যে দরাদরি চলতো না, তা নয় :

পণ্য নিয়ম করি তুহ্মি যাহ ঘর।
সর্বথায় দিব বিহা আন গিয়া বর।।
এহা শুনি ধর্মকেতু কহে ত্বরাত্বরি।
নিশ্চয় করিয়া কহ কথ লইবা কড়ি।।
পুষ্পকেতু বলে সখা করি দরাদরি।
দুইখান খুঞিয়া (মোটা শাড়ী) দিবা তের বুড়ি কুড়ি।
ধর্মকেতু বলে সখা করি দরাদরি।
একখান খুঞিয়া দিমু কড়ি নয় বুড়ী।।[১২৭]

শ্বশুর বাড়ীতে কন্যার মান-মর্যাদা ও আদর-যত্ন এই পণের উপর নির্ভর করতো।[১২৮] হিন্দু-সমাজে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন থাকায় কোন কোন কন্যার সারাজীবন পার হ'য়ে যেত সমবর্ণের বর খুঁজতে। পিতা বা অভিভাবকরা যদি ব্যর্থ হতেন তখন অনূঢ়া কন্যা মন্দিরে সেবাদাসী বা রূপজীবীর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হ'ত।[১২৯] দরিদ্র পিতা একটি কাব্যে তাঁর অক্ষমতার কথা বেদনার সংগে ব্যক্ত করছেন :

সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি যে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই।।
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরতিকী দিয়া।[১৩০]

কন্যা বা পুত্রের বিয়েতে অনর্থক আড়ম্বর ও অর্থব্যয়কে কোন কোন কবি নিন্দা করেছেন :

ধন নষ্ট করে কন্যা পুত্রের বিবাহে।[১৩১]

বর্ণ-ভেদ প্রথা হিন্দু সমাজে বর্তমান ছিল ব'লে পাত্র-পাত্রীর দক্ষতা বা পেশা বিয়ের সংগে সংগেই নষ্ট হ'তনা, বা পরিবর্তিত হ'ত না। এ'দক্ষতা বৈবাহিক সূত্রে রক্ষা সম্ভব হ'ত। তাই, নারীর কর্মনৈপুণ্য এ-যুগের তুলনায় সে-যুগে বেশী ছিল ব'লে আমরা ধারণা করতে পারি। পাত্রের যোগ্যতা প্রসংগে এক কবি বলেন :

করিব উত্তম কুলে আমার সোসর।
কুলে শীলে অর্থে হবে আমার সমান।
সে পুত্রেরে আমি কন্যা করিব প্রদান।[১৩২]

সমাজে পুত্র-কন্যার রাশি-নক্ষত্র অপেক্ষা ব্যক্তিগত কার্য-দক্ষতা ও চারিত্রিক গুণা-বলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত না। প্রাচীন ভারতে কুললক্ষণ ছিল নিম্নরূপ :

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম।
নিষ্ঠা শান্তি স্তপো দানম্ নবধা কুল লক্ষণম।[১৩৩]

কিন্তু বাঙ্গালী কন্যার যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল ভিন্নতর, অনেকটা পাত্রীর আত্মকৃত গুণপনার উপর নির্ভরশীল। তার দেহসৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার সংগে সংগে রন্ধন নৈপুণ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা সে-যুগের কবিরা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে—কবিকঙ্কণের 'ফুল্লরা' কালকেতুর অভিভাবকের হৃদয় জয় করেছিল দু'টি কারণে : রন্ধন-নিপুণতা এবং কেনাবেচায় কুশলতা।

ত্যাগ ও তিতিক্ষার বলে প্রেমের জন্য নারীর আত্মবিসর্জন মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের একাধিক কাহিনীতে উচ্চারিত হয়েছে। যদিও অধিকাংশের বিষয় ধর্ম-সম্পৃক্ত, তথাপি ধর্মের আবরণের অন্তরালে সাধারণ নারীর সুকোমল বৃত্তি উৎসারিত ত্যাগের অনুশীলন স্পষ্ট। বৈদিক যুগের জীবনাদর্শের প্রভাবে[১৩৪] হোক্ বা বাংলাদেশের মুসলিম শাসন-প্রভাবে হোক—প্রাচীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় বহু-বিবাহ অসমর্থিত ছিল না। তবে, নিষ্ঠাবতী স্ত্রী এমনও ছিলেন যাঁরা পুনর্বিবাহের আশঙ্কায় বা অবাঞ্ছিতের অঙ্কশায়ী হওয়ার লজ্জায় প্রাণ দিতে কুন্ঠিত হতেন না। 'বীরাঙ্গনা সখিনা' প্রাচীন বাংলা কাব্যের এমনি একটি চরিত্র। যে অসাধ্য-সাধনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে দেওয়ান ফিরোজ খাঁ'র তরুণী-স্ত্রী সখিনা অসি-ধারণ করেছিল, তা' মুহূর্তে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায় স্বামীর কাছ থেকে তালাক-নামা হাতে পেয়ে :

তালাক নামা পড়ে বিবি ঘোড়ার উপরে।
সাপেতে দংশিল যেন বিবির শিরে।।[১৩৫]

সতীদাহের মত বাংলাদেশে আত্মাহুতি বা নারীর সম্মানের জন্য হত্যা সে-যুগের সম্ভ্রান্ত রমণীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 'বাহরিস্তান-ই-গায়বী' গ্রন্থে এ'উল্লেখ রয়েছে।[১৩৬] যখন শত্রুপক্ষের নিকট পরাজয় সুনিশ্চিত, তখন নবাব, সামন্ত-শাসক ভুঞা, বা আমীর ওমরাহ্‌গণ প্রত্যেকেই তাঁদের নারীদের হত্যা করতেন।[১৩৭] বিধবার জীবনে কোন সুখ-সম্পদ, বিলাস-বৈভব বা অঙ্গসজ্জার অধিকার ছিল না। একটি কাব্যে বিবরণ পাওয়া যায় যে—অলপবয়স্ক বিধবা কন্যার বেদনা দেখে পিতামাতা তাকে সিঁদূরের পরিবর্তে ফাগ, শাঁখার পরিবর্তে সোনার চুড়ি এবং খুঞা'র পরিবর্তে পাট শাড়ী পরবার জন্য বলছেন।[১৩৮] বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা' মেয়ে-মহলে শ্লাঘার বিষয় ব'লে বিবেচিত হ'ত না। ময়মনসিংহ গীতিকায় মলুয়ার বৈধব্য-মুহূর্তের প্রতিজ্ঞা ছিল :

শ্বশুর বাড়ী থাকবাম আমি কইর‍্যাছি মন।
সেইত আমার গয়াকাশী সেইত বৃন্দাবন।।
শাশুড়ীর সেবা কইর‍্যা ধর্ম আমি চাই।
ঘরেতে আছ এ বুড়া থুইয়া কেমনে যাই।।[১৩৯]

শাশুড়ীর প্রতি বধূর ভক্তি-নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য মধ্যযুগের অপর এক কাব্যে কবির সতর্কবানী রয়েছে :

শাশুড়ী বিমুখী পতি সম্ভাষে অকাজ।
মক্কা গৃহ পৃষ্ঠে রাখি যেহেন নমাজ।।[১৪০]

সহমরণ, সতীদাহ ইত্যাদি প্রথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সে-যুগের সমাজে প্রচলিত থাকলেও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ঠিক সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার প্রমাণ দুর্লভ। সতীদাহের সাগ্রহ অনুসরণের পরিবর্তে অস্বীকৃতির স্বাক্ষর শুকুর মাহমুদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' কাব্যে রয়েছে। উক্ত কাব্যে দেখা যায়—সহমরণ-কালে সাজানো চিতা থেকে অন্তঃসত্ত্বা রাণী ময়না পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা করেন। পরবর্তী-কালে তিনি একটি পুত্র-সন্তান জন্ম দেন—যিনি রাজা গোবিন্দচন্দ্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কন্যার বিবাহের সময় পিতামাতা পাত্রের অর্থসংগতির দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে কুলের প্রতি নজর দিতেন। বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন-প্রবর্তিত চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হ'লেও উচ্চবর্ণের কন্যা নিম্নবর্ণের পুরুষকে বরণ করতে পারতো। অসবর্ণ বিবাহের ফল সঙ্কর জাতি; সমাজ ক্রমশঃ সে-সব জাতিরও বর্ণ বিভাগ শুরু করল। ফলে, হিন্দু সমাজে অসমর্থিত প্রেমলীলা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াল। বাংলা কাব্যে এই অসবর্ণ বিবাহের বা প্রণয়ের বহু চিত্র পাওয়া যায়।

রজকিনী রামীর সংগে কবি চণ্ডীদাসের প্রণয়ের ফলে সমাজবিদগণ শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল :

ধোবিনী সহিতে চণ্ডীদাস
তাথে জাতিপাত হ'ল ছাড়া।[১৪১]

অর্থসঙ্গতি

সে-যুগের নারীদের অধিকাংশই পরিবারের পুরুষ সদস্যদের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল।[১৪২] তবে, হিন্দু-নারী অপেক্ষা মুসলিম-নারীর পিতার সম্পত্তিতে অধিকার ছিল বেশী। সে-কারণে, স্বামীর সংসারে তার নিজস্ব মতামত এবং কর্তৃত্বের অধিকারে খুব একটা প্রশ্ন উঠতো না। পুত্র-কন্যা এবং স্বামীহীন মুসলিম নারীও পিতার বিত্তের জন্য সমাজে মর্যাদা লাভ করতেন। বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনীতে সে-যুগের বাঙ্গালী নারীদের অলঙ্কার-প্রিয়তার কথা সুবিদিত। এই অলঙ্কার-প্রিয়তা থেকে ধারণা হয় যে, তাঁদের জীবন আর্থিক নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ ছিল।

চর্যাপদে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর রাজা বিজয়সেনের আমলে লক্ষ্য করা যায়—নগরবাসী বিত্তশালী ধনীকন্যারা স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কার পরত। কিন্তু দরিদ্র গ্রামাঙ্গনাদের সে-সমস্ত আভরণ গ্রহণ করা দূরের কথা, দেখবারও সৌভাগ্য হ'ত না। স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্মিত অলঙ্কারের পরিবর্তে তারা ময়ূর-পুচ্ছ, গুঞ্জরা গাছের বীজ, পুঁতি, কচি তাল-খেজুর পাতা ইত্যাদির অলঙ্কার পরত।[১৪৩] চর্যাপদে শবরী বালিকার কণ্ঠেও ছিল গুঞ্জরী-মালা :

মোরঙ্গ পীচ্ছ পরিহান সবরী গীবত গুঞ্জরী মালা।

সাজ-সজ্জা বা অলঙ্কারের বিবরণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র যেমন রয়েছে—তেমনি এর বিপরীত চিত্রও বাংলা এবং সংস্কৃত কাব্যে রয়েছে :

ধূমৈরশ্রু নিশাতয় দহ শিখয়া দহন মলিন য়াঙ্গাবৈঃ
জাগরয়িষ্যতি দুর্গত গৃহিণী তাং তদপি শিশির নিশি।

("তার শীত বস্ত্র নেই, সারারাত খড় জ্বালিয়ে সে শীত নিবারণ করে, সমস্ত শরীর ভস্মে ছেয়ে গেছে, ধোঁয়ায় চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত"।)

জনসাধারণের একটি শ্রেণীতে সর্বদাই দারিদ্র্যের দাবদাহ প্রজ্জ্বলিত ছিল। এক বাঙ্গালী কবির সংস্কৃত শ্লোকে আমরা দেখতে পাই শিশুদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্যে এক জন্ম-দুঃখিনী জননীর আকুল নিবেদন :

তার এমন সামর্থ্য হয় যেন স্রষ্টা একটিমাত্র রুটি দিয়ে একশত দিন পর্যন্ত তার শিশুদের খাওয়াবার শক্তি তাকে দেন।[১৪৫]

কোন কোন গ্রন্থের বিবরণ থেকে ধারণা করা যায়—সে-যুগের মানুষের এবং মেয়েদেরও সাজসজ্জার চাহিদা ছিল কম, কিন্তু সন্তোষ ছিল বেশী। 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থে বিজয় সেনের জবানীতে এ'জাতীয় একটি বিবরণ রয়েছে। উক্ত গ্রন্থে রাজা বিজয়সেন বলেন :

আমার স্ত্রীপুত্র রয়েছে ঘরে ভাঙা খোরা আছে, কলসীতে খুদ আছে।
তাহ'লে আমি হতভাগ্য কি সে?

এ ভাবে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের যতই গভীরে দৃষ্টিপাত করা যায়, ততই আমরা উপলব্ধি করি যে—সে-যুগের মানুষের, বিশেষ ক'রে নারীর জীবন উজ্জ্বল সুখে পরিপূর্ণ ছিল। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল না সত্য, কিন্তু জীবন ক্ষেত্রে, সেকালের মেয়েদের অবস্থিতি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই 'যুসানামা' কাব্যে কবি আব্দুল মুহম্মদ (সপ্তদশ শতাব্দী) বলেছেন—'নারী না থাকিলে পুরুষ কিছু না হএ'। সমাজের বৃহত্তর যাত্রাপথের বিজয়চক্র ছিল তাঁদের মঙ্গলহস্তের সহায়তায় সতত-সঞ্চরমান।

অবরোধ, অশিক্ষা এবং কুশিক্ষায় নারীর স্থান বর্তমানে এসে পৌঁছেছে স্থবির সম্পত্তি বা আসবাবপত্রস্তের মধ্যে। নারীর মর্যাদাচ্যুতির এই ইতিহাস যে অতি অর্বাচীন কালের, আমাদের ঐতিহ্যের সংলগ্ন নয়—বরং স্বয়ংসৃষ্ট, আলোচ্য প্রবন্ধ তারই কিঞ্চিৎ আলোকাভাস-মাত্র।

তথ্যনির্দেশ

১ আবদুস শুকুর মহাম্মদ বিরচিত, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস (সম্পা.), শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, ঢাকা, ১৩৩২, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৭ (সম্পাদকীয়)

২ ডাকের বচন, (আ. দশম শতাব্দী) দ্রষ্টব্য: প্রভাসচন্দ্র সেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বাংগালীর দৈনন্দিন জীবন, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা ১৩২৭, পৃ. ৯০

৩ দীনেশচন্দ্র সেন, মৈয়মনসিংহ গীতিকা, কলিকাতা, ১ম খণ্ড ১৯৫৮, পৃ. ৩৩১

৪ সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৩৫৩, পৃ. ৫৫

৫ সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী কলিকাতা, ১৩৫৩, পৃ. ৫২

৬ দৌলত উজীর বাহ্রাম খান, লায়লী মজনু, (সম্পা.) আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ১৫৯

৭ দোনাগাজী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' (সম্পা.) আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৩৭৬

৮ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সংকলিত, পৃ. ২৫

৯ T. C. D. Gupta, Aspects of Bengali Society, Calcutta, 1935, P. 49

১০ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, Traditional culture in East Pakistan, Dacca, 1963, P. 131

১১ দীনেশচন্দ্র সেন, মৈয়মনসিংহ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯

১২ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, (সম্পা.) বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, নিউদিল্লী, ১৯৬১, পৃ. ৬৮

১৩ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

১৪ প্রভাসচন্দ্র সেন, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৭, পৃ. ১০৪

১৫ প্রভাসচন্দ্র সেন, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৭, পৃ. ১০৪

১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, সেকাল, ৮ম সং, ১৩৭৯, পৃ. ৪১০

১৭ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১৮ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিকী, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৯৮

১৯ অনুবাদ অংশ, প্রাগুক্ত, সাংস্কৃতিকী (২য় খণ্ড), পৃ. ৯৮)
সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৬৬, পৃ. ৪৮২

২০ শুকুর মাহমুদ, গুপিচন্দ্রের সন্যাস, (সম্পা.) আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৮৯

২১ ঘনরাম চক্রবর্তী, শ্রীধর্মমঙ্গল, (সম্পা.) শ্রীপিযূষকান্তি মহাপাত্র, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৭৩

২২ দোনাগাজী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

২৩ দ্বিজ মাধব, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৪২

২৪ T. C. D. Gupta, Aspects of Bengali Society, Calcutta, 1935, P. 4-5

২৫ আবদুস শুকুর মাহমুদ বিরচিত, (সম্পা.) আবুল কামাল মোহাম্মদ জাকারিয়া, গুপিচন্দ্রের সন্যাস, ১৯৭৪, পৃ. ৮৬

২৬ আবদুস শুকুর মাহমুদ বিরচিত, সম্পাদক: আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, গুপিচন্দ্রের সন্যাস, ১৯৭৪, পৃ. ৮৭

২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

২৮ দ্রষ্টব্য : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড়ু চণ্ডীদাস, সম্পা. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ১৩৬। 'নির্মল কমল বদনে/নীল উৎপল নয়নে/রতন কুণ্ডল শোভেকনে/ মাণিক দশন যুতী/পিএ শোভে গজমুতী/জাএ রাহি তার দরশনে'।

২৯ উজ্জ্বল মজুমদার, বাংলা সহিত্যে সমাজ-চেতনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শ্রাবণ-আশ্বিন, কলিকাতা, পৃ. ১৩২

৩০ আলাওল, পদ্মাবতী, (সম্পা.) সৈয়দ আলী আহসান, ঢাকা, পৃ. ৫৭০

৩১ আলাওল, পদ্মাবতী, (সম্পা.) সৈয়দ আলী আহসান, ঢাকা, পৃ. ৫৭০

৩২ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, (সম্পা.) বসন্ত ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৩৩ দ্বিজ বংশীদাস, মনসামঙ্গল। Aspects of Bengali Society, T. C. D. Gupta প্রণীত, Calcutta, 1935, P. 50 গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৩৪ সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, ২য় সং, পৃ. ৪৮২

৩৫ দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৯৩২, পৃ. ১৫

৩৬ সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ১৩৫৩, পৃ. ৫২

৩৭ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পা.) শব্দসূচী : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃ. ২৯১

৩৮ বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, (সম্পা.) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ৪২

৩৯ শেখ সাদী, গদা মল্লিকা সম্বাদ, সওয়াল সাহিত্য, (সম্পা.) আহমদ শরীফ, ১৯৭৬, পৃ. ১০৮

৪০ বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (সম্পা.) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ১৩১ এবং ১৩৬

৪১ T. C. D. Gupta, Aspects of Bengali Society, Calcutta, 1935, P. 45—55

৪২ দোনাগাজী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, (সম্পা.) আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৭

৪৩ দোনাগাজী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, (সম্পা.) আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৪৪ দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী, দ্রষ্টব্য. সৈয়দ এমদাদ আলী, 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতার জন্য কি মুসলমান দায়ী ?' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩২৫, পৃ. ৩২৩

৪৫ M.A. Rahim, Social and cultural history of Bengal. Vol. II, Karachi, 1967, p. 236

৪৬ ময়নামতীর গান, দ্রষ্টব্য উজ্জ্বল মজুমদার, বাংলা সাহিত্যে সমাজ চেতনা, "সাহিত্য সংস্কৃতি", শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮২, পৃ. ১৩৩

৪৭ "আমার জাতীয় ধর্ম মাথায় পসার/যাহার প্রসাদে সুখে আছে পরিবার/দেব পিতৃলোক পূজি জ্ঞাতি গোত্র তুষি/রাজকর দেই মোরা নিজ ঘরে বসি/খাই বিলাই আর করিযে সঞ্চয়/যা' কিছু দেখ এই পশারেতে হয়"/বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৪৮ কালকেতু উপাখ্যান, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ১৫

৪৯ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল (সম্পা.), সুকুমার সেন, কলিকাতা, ১৩৮২ এবং মঙ্গলচণ্ডীর গীত গ্রন্থ (দ্বিজ মাধব রচিত)

৫০ আবদুল হাকিম, লালমতী সয়ফুলমুলুক, বরেন্দ্র মিউজিয়াম গ্রন্থাগার, পুথি নং ১৮, পত্রাঙ্ক নং ৮০-ক

৫১ "প্রভাতে ছাগল লয়্যা চলিল খুল্লনা / আঁচলে বান্ধিল রামা চালু অর্ধ কোনা"। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত, (সম্পা.) সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৫২ ভারতচন্দ্র, অন্নদা মঙ্গল, সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (১ম খণ্ড), পৃ. ২০৩

৫৩ Siyar-al-Mutakhkherin, Gulam Hussain Tabatabai, (Tr.) Haji Mustafa, Cal. 1989, pp. 11-13

৫৪ গোলাম হোসেন সলীম, রিয়াজ-উস-সালাতীন বা বাংলার ইতিহাস (অনু.) আকবরউদ্দীন, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৮

৫৫ M. A. Rahim, Social and cultural history of Bengal, Vol. II, p. 236

৫৬ Robert Orme, Historical Fragment of the Moghul Empire (2 Vols.), London, 1805, দ্রষ্টব্য : ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ১৯৬৯

৫৭ আহমদ শরীফ, সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ২৭২, ১৯২-৯৩

৫৮ এস. এম. আবদুল আলী, ঢাকার মসলীন, রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২০, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩২

৫৯ নলিনীকান্ত ভট্টশালী, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, আবদুস শুকুর মহাম্মদ, ঢাকা, ১৩৩২, (সম্পাদকীয় মন্তব্য) পৃ. ৫৭

৬০ সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী, কলিকাতা, ১৩৫৩, পৃ. ৫২

৬১ K. N. Dikhsit, Excavations of Pahar pur, Delhi, 1938, Plate No. XIIX

৬২ বাইশ কবির মনসামঙ্গল, (সম্পা.) আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ৬

৬৩ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, কলিকাতা, পৃ. ৯২

৬৪ ঘনরাম, ধর্মমঙ্গল, (সম্পা.) শ্রী পিযূষকান্তি মহাপাত্র, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৬২২

৬৫ বিজয় গুপ্ত, মনসামঙ্গল, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সংকলিত, কলিকাতা, ১৩৩৫, পৃ. ৬৯

৬৬ মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ৯৬

৬৭ মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ৯৬

৬৮ লালমতী সয়ফুলমুলক, আবদুল হাকিম, বিরচিত (১৭শ শতাব্দী) ব.রি.মি. বা–পুঁথি নং ১৮, পত্রাঙ্ক নং ৯৮

৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৭০ শেখ সাদী, গদা মল্লিকা সম্বাদ, সওয়াল সাহিত্য, (সম্পা.) আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১১১

৭১ ঘনরাম চক্রবর্তী, শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল, (সম্পা.) শ্রী পিযূষকান্তি মহাপাত্র, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৭৬

৭২ দোনাগাজী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

৭৩ দোনাগাজী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, (সম্পা.) আহমদ শরীফ, ১৯৭৫, পৃ. ৩৮৫

৭৪ দৌলত উজীর বাহরাম খান, লায়লী মজনু, (সম্পা.) আহমদ শরীফ, ১৯৬৬, পৃ. ৮৫

৭৫ মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আরকান-রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ৯৬

৭৬ দৌলত উজীর বাহরাম খান, লায়লী মজনু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৭৭ দোনাগাজী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২

৭৮ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, (সম্পা.) সুকুমার সেন, ধনপতি উপাখ্যান, প্রাগুক্ত সং, পৃ. ১৬৯

৭৯ দোনাগাজী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, (সম্পা.) আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৩৯২

৮০ "এক দুই তিন চারি বৎসর যবে যায়/কন্যাগণ সংগে রামা ধূলায় খেলায়"/সুকুমার সেন সম্পাদিত, চণ্ডীমঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৮১ শুকুর মাহমুদ, গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস, (সম্পা) আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৩৬

৮২ A. L. Basham, The wonder that was India, London, 1961, P. 181

৮৩ The Sadukti Karnamrita (ed.), S. C. Banerjee, Calcutta, 1965, P. 142 Qt. by Dr. Sahanara Hussain, 'The Position of women in Pre-Muslim Society. The Journal of the IBS, Vol. No. 1, 1976, p. 166

৮৪ আলাওল, পদ্মাবতী, (সম্পা.) সৈয়দ আলী আহসান, ঢাকা, পৃ. ৩৯৬

৮৫ মুহম্মদ আকিল, মুসানামা, (সম্পা.) আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, ১৩৬৭, পৃ. ৬১

৮৬ রামেশ্বর, শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ণ, (সম্পা.) শ্রীযোগিলাল হালদার, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ২১৫

৮৭ আলাওল, সিকান্দার নামা, (সম্পা.) আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১৪৬

৮৮ নওয়াজীশ খান, গুলে বকাওলী, (সম্পা.) রাজিয়া সুলতানা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১১৬

৮৯ রামেশ্বর, শিবায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৯০ আলাওল, পদ্মাবতী, (সম্পা,) সৈয়দ আলী আহসান, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৩১৬

৯১ আবদুল হাকিম, লালমতী সয়ফুলমুলক, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, পুঁথি নং ১৮, পত্রাঙ্ক নং ১৭৯

৯২ ভারতচন্দ্র, মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.), ১৯৬৭, পৃ. ৮৭

৯৩ ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কলিকাতা

৯৪ ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫১

৯৫ ভারতচন্দ্র, মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান, (সম্পা.) মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ৮৭

৯৬ দৌলত কাজী, সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী (সম্পা.) আবদুল হাফিজ ও মযহারুল ইসলাম, ঢাকা, পৃ. ৫২

৯৭ সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৩৫৩, পৃ. ৩৪

৯৮ দেওয়ানা মদিনা, মৈয়মনসিংহ গীতিকা, দীনেশচন্দ্র সেন. (সম্পা.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭

৯৯ দীনেশচন্দ্র সেন, মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড ২য় সং. কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ৩৭৭

১০০ রামেশ্বর, শিবায়ণ, যোগিলাল হালদার, (সম্পা.) কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ১০৪

১০১ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, (সম্পা.) বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, ১৩৩৫, কলিকাতা, পৃ.৯৬

১০২ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৩৫৩ পৃ., ৫২

১০৩ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন, (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

১০৪ জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল দ্রষ্টব্য, (সম্পা.) নগেন্দ্রনাথ বসু, 'মালঞ্চ' ১৩২১, পৃ. ২৪৩

১০৫ আবদুল হাকিম, লালমতী সয়ফুলমুলক, ব. সি. পুঁথি, নং ১৮, পত্রাঙ্ক নং ৮০ ক

১০৬ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, (সম্পা.) সুকুমার সেন, পৃ. ১৫৬

১০৭ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, (সম্পা.) ১৩৩৫, পৃ. ৯৬

১০৮ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, (সম্পা.) বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, ১৩৩৫, পৃ. ৯৭

১০৯ বড়ু চণ্ডীদাস, (সম্পা.) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, কলিকাতা, ১৩৬৪, বংশীখণ্ড

১১০ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙালী জীবনের ছায়াপাত, মালঞ্চ কলিকাতা, ১৩২১ কার্তিক ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ৭৫০

১১১ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

১১২ নরোত্তম দাস, বৈষ্ণব পদাবলী, (সম্পা.) দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩য় সং, কলিকাতা, ১৯৪৫ (নরোত্তম দাসের পদ)

১১৩ আবদুল হাকিম, লালমতী সয়ফুলমুলক, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম সংগ্রহ, পত্রাঙ্ক নং. ৬১ ক, পুথি নং. ১৮

১১৪ মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, ঢাকা, পৃ. ৯৭

১১৫ R. C. Majumdar, History of Bengal, vedic Age—1, P. 62, 71, 104-5, 108, 112.

১১৬ ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৯৬

১১৭ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, দীনেশচন্দ্র সেন ও হৃষিকেশ বসু (সম্পা.), কলিকাতা, পৃ. ৯৬

১১৮ দৌলত কাজী, সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী, ড: মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৬৯ ১ম সং., পৃ. ১১৩

১১৯ M. Winternitz—A History of Indian literature, Vol. A V-3, P. 30

১২০ খনার বচন। দ্রষ্টব্য : T. C. D. Gupta, Aspects of Bengal Society, Calcutta, 1935, P. 223

১২১ আবদুল শুকুর মহাম্মদ বিরচিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, (সম্পা.) শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, ঢাকা, ১৩৩২, পৃ. ৪

১২২ H. H. Risley, Tribes and Castes of Bengal, Vol. II, Calcutta, 1891, P. 229

১২৩ রামেশ্বর, শিবায়ণ, যোগীলাল (সম্পা.), পৃ. ৯৩

১২৪ বিমানবিহারী মজুমদার, 'বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩১-৪র্থ সংখ্যা, 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১২৫ দৌলত উজীর বাহরাম খান, লায়লী মজনু (সম্পা.), আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ৬৭

১২৬ কবিকঙ্কণ-মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন, পৃ. ৪২

১২৭ দ্বিজ মাধব, মঙ্গল চণ্ডীর গীতিকা, (সম্পা.) সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৪২

১২৮ রসিকচন্দ্র বসু, প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচীন সমাজচিত্র, সৌরভ, শ্রাবণ, ১৩২০, পৃ. ৩১৭

১২৯ উমা সেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাধারণ মানুষ, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১৮১

১৩০ রামেশ্বর, শিবায়ন।

১৩১ চৈতন্য ভাগবত। দ্রষ্টব্য : প্রভাসচন্দ্র সেন, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৭

১৩২ কেতকীদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, শ্রী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, নিউদিল্লী, পৃ. ২১

১৩৩ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারত মহিলা, কলিকাতা, ১৮৯১, পৃ. ৬-৭

১৩৪ Vedic Age, R. C. Mazumdar, P. 388-89 (vi 28, 5, x 27, 2)

১৩৫ দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান, ১৯৩৮, পৃ. ১৩৫

১৩৬ Batristan-i-Ghaybi-Mirza Nathan, (Sr.) M. I. Borah, Gauhati, Vol. No. I 1936, P. 141

১৩৭ M. A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol. No. II, Karachi, 1967, P. 240

১৩৮ তমোনাশ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪–৫

১৩৯ দীনেশচন্দ্র সেন, (সম্পা.), মৈমনসিংহ গীতিকা, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ৫৩

১৪০ আবদুল হাকিম, লালমতী সয়ফুলমুলক, বরেন্দ্র মিউজিয়াম পুঁথি নং ১৮, পত্রাঙ্ক নং২৩২ ক

১৪১ চৈতন্য ভাগবত। প্রভাসচন্দ্র, 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা–৩য় সং, ১৩২৭

১৪২ M. A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol. II, Karachi, 1967, P. 234

১৪৩ আনিসুজ্জামান, চর্যাগীতির সমাজচিত্র, পাণ্ডুলিপি, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৮১, পৃ. ১৪

১৪৪ গোবর্ধন আচার্য, আর্য সপ্তশতী দ্রষ্টব্য, 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, পৃ. ৪৬

১৪৫ ডক্টর সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ১৩৫৩, কলিকাতা, পৃ. ১৭